

@@রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' - গল্পের চরিত্র বিশ্লেষণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' গল্পে মূলত তিনটি চরিত্র - পোস্টমাস্টার, রতন এবং প্রকৃতি। গল্পটিতে প্রকৃতি কেবল স্থানিক ও ভৌগোলিক পরিচয় বহন করে নি, গল্পের প্রধান দু'টি চরিত্রের আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং গল্পের বিস্তার ও পরিণতিতে অমোঘ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

গল্পটির ঘটনাকাল যে ঠিক কতদিনের, তা বলা যাবে না। তবে তা যে স্বল্পদৈর্ঘ্যের তার ইঙ্গিত আছে। বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে রতন ও পোস্টমাস্টার পরস্পরের হৃদয়ের কাছাকাছি এসেছে, সম্পর্কের মধ্যভাগেও রয়েছে শ্রাবণের অন্তহীন বর্ষণ এবং গল্পটির শেষে পোস্টমাস্টারের বিদায় দৃশ্যও নদী বর্ষাবিস্ফারিত। বর্ষা-প্রকৃতির এই ছবি অন্তত কয়েকটি জায়গায় রতনের আবেগকে চমৎকারভাবে ইঙ্গিত করেছে। পোস্টমাস্টার সম্মুখে রতনের মত অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে পড়ানোর ভার নিয়েছেন, সে সানন্দে যুক্তাক্ষর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। আর ঠিক পরের চরণেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল'।

পোস্টমাস্টার আর রতন- এ দুটি চরিত্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিরাট ফারাক। এই ফারাকটি গল্পের বাক্যবিন্যাসে এবং উপস্থাপনায় পরিষ্কার। এই গল্পে পোস্টমাস্টারের প্রসঙ্গ এনে ফেলা হয়েছে বেশ সম্ভবের সঙ্গে- আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। আর রতন এসেছে পোস্টমাস্টারের প্রয়োজনে বর্ণনার সূত্রে, জলে ভেসে আসা কুটোর মত। কুটোর নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই।

'গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন'- এই বাক্যে অনিবার্যভাবে সচেতন শিল্পকর্মের অঙ্গ হিসাবে এসেছে 'চারিটি-চারিটি' শব্দটির তুচ্ছার্থে অমোঘ প্রয়োগ। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে, রতন ও পোস্টমাস্টারের প্রথম কথাবার্তার কথা। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় আবহটা এরকম- 'তবে ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন- রতন'।

সম্পর্কের অবতারণা পোস্টমাস্টার করেছিলেন 'প্রদীপ জ্বালিয়ে', রতনের মনে অন্যতর চেতনার উন্মেষ ও প্রদীপের শিখা এই সূত্রে সমীকৃত হয়ে যায়, উন্মেষপর্বে সে শিখা স্বভাবতই ক্ষীণ। তারপর শিক্ষার উজ্জ্বলতা ও রতনের মনে বালিকা পর্বের বিদায়বার্তা উত্তরণ। এ প্রদীপ শিখা আবার আমরা দেখেছি গল্পের শেষদিকে। নিরাবেগ কণ্ঠে পোস্টমাস্টারের বিদায়বার্তা রতনের কাছে বিনামেঘে বজ্রঘাত, স্বভাবত: সে নিঃপ্রভ। তাই আবার প্রদীপের প্রসঙ্গ রতনের মন-দর্পণের ছবি নিয়ে ফিরে এসেছে, তার শিখা তখন মিটমিটে।

কিন্তু এখনই শেষ পর্ব নয়, পর্বান্তরগুলো আগে লক্ষ্য করার মতো। এ-কথা সে-কথায় রতন ও পোস্টমাস্টারের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বাড়ে। পরস্পরের বাড়ির কথা, মা-বাবার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে দুটি হৃদয় কাছাকাছি আসে। শিক্ষিত শব্দে পোস্টমাস্টার হয়তো অন্তরের দিক থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে পারেন, কিন্তু স্নেহ-কাঙালী রতন পারে না, জলসেচনে অঙ্কুর এখন পল্লবিত লতা। রতনের এই

হৃদয়কে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেছেন একটি বাক্যের ব্যবহারে : ‘এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত।’

এ ধরনের প্রকাশকে প্রেম বলছি না, অনাথা রতন এখনও দেহ-মনে বালিকা। তাই পোস্টমাস্টার যখন বর্ষার দুপুরের ঈষৎ তপ্ত বাতাসে এক শূন্যতাবোধে আক্রান্ত, রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল। তার হৃদয়পটে কোথাও রঙ ধরেনি, মস্তুর নয় তার চলন, আচরণ ও বচনেও আসেনি লজ্জা। তাই ‘পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাওয়া’ এ পর্যায়ে তার পরিচয়জ্ঞাপক চরণ হয়ে উঠেছে। রতনের মানসপরিণতির সূচনা হয় পোস্টমাস্টারের লেখাপড়া শেখানোর উদ্যোগের মধ্য দিয়ে। পোস্টমাস্টার প্রথমভাগের স্বরবর্ণ শিখিয়েছেন, রতন একই সঙ্গে হৃদয়বোধের স্বরবর্ণের পাঠ নিয়েছে। পোস্টমাস্টারের সযত্নে-সাহচর্যে রতনের স্নেহকে প্রেমতৃষ্ণায় রূপান্তরিত করেছে, অল্পদিনেই। হৃদয়ের এই অগ্রগমন বড় তাড়াতাড়ি ঘটে।

আর এই পর্যায়ে ‘যুক্তাক্ষর’ কেবল বাংলা বর্ণমালার প্রতিনিধিত্ব করেনি, দু’টি হৃদয়কে যুক্ত করার এক মানবিক প্রক্রিয়ায় বিস্তারিত হয়েছে। শিক্ষক তাঁর পাঠ্যসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন, কিন্তু পড়ুয়া পাঠ্য অবলম্বন করে অনেক দূরে চলে যেতে পারে, যেখানে যুক্তিক্রম মোটেই অনিবার্য নয়। তাই পোস্টমাস্টার যা পারেনি, রতন তা পেয়েছে। পাঠ এখানে রতনের বোধমন্ড।

এই পর্যন্ত, দেখব, রতনকে বারবার বালিকা বলে (তিনবার) চিহ্নিত করা হয়েছে। ‘বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না’- এই বিভাজিকা বাক্যটির পরে ‘বালিকা’ শব্দের ব্যবহার আগের মতই তিনবার, কিন্তু রতনকে আর বালিকা দেখবার চেষ্টা একবারও হয় নি। তার কারণ মনের দিক থেকে রতন তখন পরিণত-বয়স্কা, প্রেম তাকে পরিণত করেছে। যে-রতন পোস্টমাস্টারের স্নেহধন্যা এক পরিচারিকামাত্র ছিল, পোস্টমাস্টারের প্রশ্ন ও নিঃসঙ্গ চিত্তের অবলম্বন-অবেশা সরলা বালিকাকে জাগিয়ে দিয়েছে।

প্রবাসে অসুস্থতা যেমন মানুষকে অসহায় করে, দুর্বল করে, তেমনি ভালবাসার লোককে (তা সে যে সম্পর্কেরই হোক) অনেক কাছে নিয়ে আসে এবং এই নৈকট্যের মধ্য দিয়ে অল্পদিনেই ভালবাসা পরিণত হয়ে ওঠে। পোস্টমাস্টারের অসহায় আত্মসমর্পণ নিশ্চয়ই সজ্ঞান ভালবাসার স্মারক নয়, জ্বরাতুর আবেশের ফল। কিন্তু রতনের মত সরলা পল্লীবালার কাছে তা এক বড় অবলম্বন হয়ে উঠেছে, হৃদয়মোচনের অনিবার্য গতিতে সে বালিকাস্তর পেরিয়ে ভালবাসার এক মুক্ত-অঙ্গনে পৌঁছে গেছে- সেখানে প্রেমিকা, জননী ও ভগ্নী একাকার। এইবার তার সক্রিয়তা ও আকুলতা লক্ষ্য করার মতো : “বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল- ‘হ্যাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি?’”

রতনের সামর্থ্য বড় কম, একা হাতে তার কাজ স্বভাবতঃ থেমে থেমে ছোট পরিসরে। এখন রতন পরিণত এবং একইসঙ্গে উদাসীন (নির্লিপ্ত বলা ভাল) পুরুষটির কাছে নিবেদিতা এক নারী। পোস্টমাস্টারের প্রত্যাখান তার এই মনকে যতটা অশ্রুভারাতুর করেছে, ততটাই প্রেমঋদ্ধ করেছে। অভিমানমিশ্রিত এই প্রেম স্পষ্টতই প্রকাশিত দু’টি উক্তি-

এক : ‘রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এই নরমকথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, “না, না, তোমাকে কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাইনে।”’

দুই : ‘রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, ‘দাদাবাবু তোমার দু’টি পায়ে পড়ি, তোমার দু’টি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না, তোমার দু’টি পায়ে পাড়ি, আমার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না- বলিয়া এক-দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।’

পোস্টমাস্টারের দান রতন নিতে চায় নি, সবরকম বদান্যতাকে সরোদন অস্বীকার করেছে। ‘পিতৃমাতৃহীন অনাথা’ রতন আবার খাওয়া-পরার কষ্টের মধ্যে পড়বে, এটা বোঝার মত বুদ্ধি তার আছে, তবু অস্বীকার। এমন বিপরীত কাণ্ডের একটিই মাত্র কারণ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ- ‘নারীহৃদয় কে বুঝিবে’। আমরাও তাই বলি। স্নেহ নয়, দয়া নয়, পোস্টমাস্টারের কাছে রতনের প্রত্যাশা ছিল অন্যরকম; তা আহত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। যাকে রতন ভালবেসেছে, যার প্রশ্রয় ও সাহচর্যকে রতন ভালবাসা বলে জেনে এসেছে, বিদায়কালে তার কাছ থেকে ভালবাসাই চেয়েছিল রতন। স্নেহ, দয়া কখনই ভালবাসার বিকল্প হতে পারে না। পোস্টমাস্টারের নির্মম উদাসীনতায় রতনের ভালবাসা নিরবলম্ব, কিন্তু সুচিহ্নিত। সীমাহীন বেদনার মধ্য দিয়ে রতন এই ভালবাসার প্রমাণ রেখেছে, তাকে ভুল বুঝবার উপায় নেই। গল্পের পরিণতিতে রতনের প্রেমকে স্নেহ বলে ভুল করবার অবকাশ থাকছে না।

রতনের প্রেমের অভ্রান্ত প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ গল্পের উপসংহার রেখেছেন, তাকে ‘ভ্রান্তিপাশ’ বলেছেন। উদাসীনের কাছে প্রেমের প্রত্যাশা ভ্রান্তি বৈকি, তবু এই ভ্রান্তি রতনের ক্ষেত্রে অনিবার্য, এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে, পড়ার জন্য তার ব্যাকুলতাও অনিবার্য। ‘দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশ’ বলতে দ্বিতীয় কোন পুরুষকে রতন আবার ভালবাসবে, এমনতরো সম্ভাবনার কথা কোন কোন বন্ধু আমাকে বলেছেন। এখানে আমার নিবেদন- এ ক্ষেত্রে ভালবাসার পাত্রের কথা নয়, ভালবাসার ধারকের কথা ভাবুন। ভাবুন রতনের কথা, প্রতিদানহীন এই ব্যর্থ ভালবাসার বেদনা ধারণ করার জন্য যে নারী হৃদয় অনন্তকাল ব্যথিত থাকে। বস্তুত গল্পটি এই বিষয়ের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। তাই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-রতনের বেদনার থেকে ভালবাসার শাস্বত আকাঙ্ক্ষা বড় হয়ে উঠেছে।

আর পোস্টমাস্টার! আপনার কোন দোষ নেই। লেখক আপনার কোন নাম দেন নি, পেশাগত অভিধায় আপনাকে চেনানো হয়েছে। গল্পের নাম, চরিত্রের নাম সবই পোস্টমাস্টার। আপনার কপাল, রবীন্দ্রনাথ আপনাকে কোন নাম দেন নি। যার নাম নেই কোন মানবিক অনুভূতিকেই সে ধারণ করতে পারে না- এ শিক্ষা আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই পেয়েছি। তাই আমাদের পোস্টমাস্টার, রতনের প্রেমকে অনুভব করতে পারেন নি, স্নেহ ও দয়ার গন্ডি পেরুনোর ক্ষমতা তার ছিল না। নাম কেবল একটি সম্বোধন চিহ্ন নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের সূত্র গড়ে তোলে এই নাম।

‘পোস্টমাস্টার’- লেখক আপনাকে নাম দেন নি, রতন আপনাকে একটা নাম দিতে চেয়েছিল- ‘দাদাবাবু’! আপনি তা-ও নিলেন না। অনেক চিঠির মাঝে আপনার নিজেরও একটি চিঠি ছিল, আপনি তা লক্ষ্য করলেন না, একই সঙ্গে তা চলে গেল দূরের স্টেশনে। অনেক পোস্ট-অফিসে ধাক্কা খেতে খেতে বহুদিন পরে যদি সে চিঠি প্রাপকের দরজায় কখন ফিরে আসে এবং স্বনামে চিহ্নিত প্রাপক তা গ্রহণ করে, আমরা, পাঠকেরা, তারই অপেক্ষায় থাকব।